মুজিবনগরে উৎপাদিত হচ্ছে আজোয়াসহ নানা জাতের খেজুর

মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমির আজোয়া, আম্বার, লুলু, খালাস, ডেগলেটনুর, কালমি, মাকতুম, সুক্কারি, বাহারি ও মরিয়ামসহ ১০টি জাতের খেজুর উৎপাদনের আশার আলো দেখছেন কুষ্টিয়া ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি বিজ্ঞানীরা।

স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগরে কমপ্লেক্সের মধ্যে পরীক্ষামুলক এই ১০ টি জাতের খেজুরের চাষ করে এখন কৃষি বিজ্ঞানীরা সফলতার পথে।

ইতোমধ্যে এই খেজুর গাছ গুলোতে থোকায় থোকায় লাল, হলুদ আর সবুজ বর্ণের খেজুরের সামাহার।

কৃষি বিজ্ঞানীরা প্রাথমিকভাবে সফলতায় থাকলেও এখনও এটি গবেষণা পর্যায়ে আছে বলে জানালেন কুষ্টিয়া ধান গবেষণা ইনিস্টিউটের কৃষিবিদ ড. মাহবুব।

তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে খেজুর গাছের চাষ ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে কৃষি বিভাগ। এটি সফল হলে কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হবে। সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা। এ অঞ্চলে সরকারিভাবে খেজুর গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন দরকার, মতামত দেন এই কৃষি বিজ্ঞানী।

কুষ্টিয়া ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ প্রথম ২০১৪ সালে দুবাই থেকে ১০ জাতের খেজুরের বীজ নিয়ে আসেন।

আজওয়া, আম্বার, মরিয়মসহ ১০টি জাতের খেজুর বীজ কুষ্টিয়া ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের মধ্যে রোপন করেন। পরে চারা উৎপাদন হয়।

এসময়ের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানীরা সৌদির মরুভূমির সাথে মিল রেখে শুস্ক আবহাওয়া ও অনুকুল মাটির খোঁজ করতে থাকেন। অবশেষে মাটির গুনাগুন পরীক্ষা করে মুজিবনগরকে বাছাই করা হয়।

‘মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প’র আওতায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স চত্বরে ২০১৪ সালে প্রায় আড়াই হাজার গাছ লাগানো হয় ।

গাছ রোপনের পর বিগত চার বছর নিবীড় পরিচর্জা করে কৃষি বিভাগ। ইতোমধ্যে এসব গাছে ধরছে ফল। সৌদির খেজুর মেহেরপুরে চাষ হওয়াই খুশি স্থানীয়রা।

এই প্রকল্পে দায়ীত্বরত কুষ্টিয়া ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ড. মাহবুব বলেন, এ অঞ্চলটা বাংলাদেশের সবচেয়ে শুষ্ক অঞ্চল।

এখানে তাপ বেশি থাকে যার কারণে মধ্য প্রাচ্যের আবহাওয়ার সাথে অনেকটা মিল রয়েছে। এজন্য খেজুর গবেষণার জন্য এই এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এটা সফল গবেষণা। বাংলাদেশে এটার চাষাবাদ সম্ভব। এখন প্রয়োজন একটা রিসার্চ সেন্টার গড়ে তোলা।

সরেজমিনে দেখা গেছে, খেজুর গাছে থোকায় থোকায় খেজুর ঝুলছে। কোনো গাছে সবুজ ও হলুদ আবার কোনোটিতে লালচে রঙের। খেজুরের স্বাদ, গন্ধ ও মানও বেশ ভাল।

সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, সারাদেশে এই খেজুর উৎপাদন করা সম্ভব হলে আমদানি নির্ভরতা অনেকটা কমে আসবে। এছাড়া সহজে পূরণ হবে পুষ্টির চাহিদা।